নবদুর্গা ও ভগবতী সারদা

প্রব্রাজিকা বেদরূপপ্রাণা

সময়টা ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ। দক্ষিণেশ্বর ভবতারিণী মন্দিরের প্রধান পুরোহিত রামকুমার চট্টোপাধ্যায় দেহরক্ষা করেছেন। পূজকপদে বৃত হয়েছেন তাঁর ছোটভাই গদাধর। এই অদ্ভুত পূজক কিন্তু কেবল নির্দিষ্ট কিছু মন্ত্র নিয়মমাফিক পাঠ আবৃত্তি করেই তাঁর কর্তব্য শেষ করেন না। প্রতিদিন পূজা শেষ করে তিনি দেবীকে গান শোনান। গভীর আবেগে গান গাইতে গাইতে তাঁর দুচোখ জলে ভেসে যায়। পূজাকালে যথানিয়মে মায়ের ধ্যানমন্ত্র উচ্চারণ করে মাথায় ফুলটি দিয়ে মানসপূজা করতে করতে নিস্পন্দ ধ্যানস্থ হয়ে তাঁর কেটে যায় দুঘণ্টা। ব্যাকুল অনুরাগে কোনও কোনওদিন সন্ধ্যারতি আর শেষ হতে চায় না। দিনে দিনে জগদম্বাকে প্রত্যক্ষ দর্শনের ব্যাকুলতা এতটাই বেড়ে ওঠে যে সেই তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে একদিন মায়েরই হাতের খড়্গে নিজের জীবন বিসর্জন দেওয়ার জন্য ছুটে গেলেন মূর্তির দিকে। অসি স্পর্শমাত্র আলোয় ভেসে গেল চারদিক। উজ্জ্বল আলোর ঊর্মিমালা চতুর্দিকে; আর সেই আনন্দঘন আলোর সমুদ্রে, সেই অসীম চেতন জ্যোতির সাগরে তিনি হারিয়ে গেলেন যেন। যখন চেতনা ফিরে এল তখন তাঁর মুখে শোনা গেল কাতর 'মা মা' ধ্বনি। 'অশেষসৌম্যেভ্যস্তু অতিসুন্দরী' কোন বরাভয়দায়িনী মূর্তির দর্শনে তিনি ভাবে বিহ্বল হয়েছিলেন?

মহিষাসুরবধের আগে দেবতাদের শুভ ইচ্ছায় যে-দেবীমূর্তি আবির্ভূতা হয়েছিলেন, তিনিও এসেছিলেন জ্যোতিঃস্বরূপে। মহিষাসুরের কাহিনি সকলের জানা। সে একশো বছর যুদ্ধ করে, দেবতাদের পরাস্ত করে স্বর্গ অধিকার করেছিল। অযোগ্য মহিষাসুর রাক্ষসী দুষ্প্রবৃত্তিগুলি থেকে নিজেকে মুক্ত না করেই দেবতার পদবী দখল করে। দানব বা দানবীয় বৃত্তির মানুষেরা কখনও বোঝে না যে দেবলোক জয় করতে হলে আগে নিজের মনোলোক জয় করতে হয়। ফলে তার দুর্বৃত্তির প্রভাব বাড়তে শুরু করে। নারকীয় দক্ষতায় স্বর্গকেও সে নরক করে তোলে। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জুড়ে শুরু হয় অশুভ আর অন্যায়ের রাজত্ব।

কিন্তু বিশ্বচরাচরকে ধারণ করে আছেন যে-শুভশক্তি তাঁর কাছে এই অসাম্য তো বেশিক্ষণ প্রশ্রয় পেতে পারে না। দুষ্কর্ম গগনচুম্বী হলে প্রত্যাঘাত আসেই। মহিষাসুরের অত্যাচারের প্রতিকারে দেবতাদের শক্তি পুঞ্জীভূত হয়ে

চরাচরব্যাপী এক বিরাট জ্যোতিঃপুঞ্জের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। সেই জ্যোতির সাগর থেকে জন্ম নেন অশুভবিনাশী এক বিচিত্র নারীমূর্তি। নিরাকারা কৃপা করে মাতৃরূপে আবির্ভূতা হন। শুভ তো কখনও অশুভ করে না—কল্যাণের আঘাতে কল্যাণেরই জন্ম হয়—তাতে সন্তানের কুপ্রবৃত্তিগুলিই নষ্ট হয় শুধু। তাই যখনই জগতে দুষ্কর্ম বাড়ে, অন্যায় আর অসাম্যের রাজত্ব শুরু হয়, তখনই শুষ্কহৃদয় নিয়ে নরনারী শান্তিবারির প্রার্থনায় ঊর্ধ্বমুখী হয়ে যে-শুভশক্তিকে কাতরভাবে ডাকে, সে বুঝি চিরকালই এক মাতৃমূর্তি—সর্বদাই সেই ডাকটি একাক্ষরা 'মা'।

শৈলপুত্রী

১২৬৮ বঙ্গাব্দ। চৈত্রমাসের এক নিশায় দক্ষিণেশ্বরে এসে পৌঁছলেন এক মঙ্গলময়ী কিশোরী। সাধনার শুভারম্ভে যে-জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তির দর্শন লাভ করেছিলেন গদাধর, সাধনার অগ্রগতির নানা পর্যায়ে এই জগতের কল্যাণের জন্য যে-মাতৃমূর্তির অভিষেকের প্রয়োজন বুঝেছিলেন, যে-জগদ্ধাত্রী শক্তিস্বরূপিণীর আবির্ভাব উপলব্ধি করে নির্বাচন করেছিলেন জয়রামবাটীর রাম মুখুজ্জের বাড়িতে কুটোবেঁধে সযত্নে-তুলে-রাখা যুগজননীকে, তিনি এক যুগসন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছলেন দক্ষিণেশ্বরে। ততদিনে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা সম্পূর্ণ হয়েছে। নির্মম স্বার্থ, হিংসা আর জড়বাদের অভিঘাতে ক্ষতবিক্ষত ক্রন্দনময় নিখিলহৃদয়ের আর্তি স্পর্শ করেছে যুগাবতারকে। তিনি জানেন, এই যন্ত্রণামুক্তির জন্য একাক্ষরা 'মা' ডাকটিকে সাকাররূপে জগতের জন্য রেখে যেতে হবে। তা-ই করলেন তিনি। বিশ্বপ্রেমধারণের পাত্র জ্যোতিঃস্বরূপিণী চৈতন্যময়ীকে আবার তপস্যায় জাগ্রত করলেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মেধাঋষি বলেছেন, এই দেবী নিত্যা, কিন্তু দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য বারে বারে আবির্ভূতা হন। কখনও ইন্দ্রাদি দেবতাদের প্রার্থনায় মহিষাসুরমর্দিনী বা শুম্ভনিশুম্ভ-নাশিনী রূপে তাঁকে দেখতে পাই, কখনও বা যুগদেবতার আহ্বানে করুণাঘন মাতৃমূর্তি সারদেশ্বরীরূপে তাঁর প্রকাশ হয়। স্থানে-কালে-প্রয়োজনে-পরিবেশে তাঁর আকার হয়তো বদলেছে, কিন্তু স্বরূপে সেই একই দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়েছে নানারূপে, নানাভাবে। দেবীশক্তির রূপবৈচিত্র্য হল নবদুর্গা। আশ্বিন শুক্লা প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত নবরাত্রিতে মা নয়টি রূপে পূজিতা হন। সেই নববিভঙ্গেও আমরা দেখি পৌরাণিকী দেবীর সঙ্গে একালে কালের প্রয়োজনে আবির্ভূতা কালাতীতার জীবনচরিত কেমন মিলেমিশে যায়।

নবদুর্গার প্রথম রূপ শৈলপুত্রী—'প্রথমং শৈলপুত্রীতি'। প্রতিপদ তিথির প্রথমা দেবী তিনি—শৈলরাজ হিমালয়দুহিতা। দেবীর তো সৃষ্টিস্থিতিলয় নেই—তবু কোনও শুভকারণে, অশুভের বিনাশের জন্য তিনি আবির্ভূতা হন। এই আবির্ভাব নানাভাবে হয়েছে। তবে আমাদের মানববোধের সীমারেখায় যখন উৎপন্না দেবীশক্তিকে আমরা মানবীরূপে দেখি, তখন খুব কাছেরটি বলে গ্রহণ করতে পারি। তাই প্রথম প্রকাশে তিনি মানবী—হিমালয় ও মেনকার কন্যা। ঝকমকে ঐশ্বর্য আর চার-ছয়-দশ

হাতের আড়ম্বর থেকে বেরিয়ে যখন চেনা দুটি হাত বাড়িয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরেন কন্যারূপিণী দেবী, তখন তিনি আমাদের বড় কাছের। 'মা' বলে কোলে উঠতে চাইব তো তাঁরই, যাঁকে ভয় পাই না, আড়ম্বরের সমারোহে আলোর ঝলকানির আড়ালে যিনি হারিয়ে যান না। আর তখনই কেবল এই দুঃখসুখে ঘেরা সংসারের আলোছায়ায় তাঁর কাছে ব্যাকুল আর্তিতে কেঁদে ওঠা যায়।

ব্রহ্মচারিণী

জয়রামবাটীর রাম মুখুজ্জের বাড়িতে এক বৃহস্পতিবারের পুণ্যলগ্নে যে-দেবী পৌষ মাসে আবির্ভূতা হয়েছিলেন, কন্যা-রূপিণী সেই শ্রীজাতাও শৈলপুত্রীর এক রূপ। তিনি পিতার আদরিণী। দুর্ভিক্ষের সময় যখন জনগণের জন্য রাজার মতন বৃহৎমনা রামচন্দ্র নিজের বাড়িতে হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি রাঁধিয়ে রাখতেন তখন তাঁর এমনই নির্দেশ ছিল যে বাড়ির সকলেও সেই আমজনতার খাবারই খাবে, কোনও বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে না। শুধু স্নেহের পুতলি সারদার জন্য ভাল চালের দুটি ভাত হবে, সে তাই খাবে। কন্যাস্নেহে উদ্বেল রামচন্দ্রের গৃহের আঙিনায় যে-দেবীর কোমল কচি পা-দুটি ঘুরে বেড়াত তিনি দেবী শৈলপুত্রী, রামচন্দ্র-শ্যামাসুন্দরী-দুহিতা শ্রীসারদা।

নবরাত্রির দ্বিতীয়া তিথিতে দেবীর ব্রহ্মচারিণী শক্তি জেগে ওঠে। ব্রহ্ম কথার অর্থ এখানে তপস্যা। যিনি ব্রহ্মে বিচরণ করেন অর্থাৎ তপশ্চরণ করেন তিনি ব্রহ্মচারিণী। 'বেদস্তত্ত্বং তপো ব্রহ্ম'—বেদ, তত্ত্ব এবং তপস্যাকে ব্রহ্ম বলা হয়। ব্রহ্মচারিণী দেবীর রূপ অতি মার্জিত, শালীন, জ্যোতির্ময়ী। তাঁর ডানহাতে জপমালা, বাঁ হাতে কমণ্ডলু।

শৈলপুত্রী দেবী পার্বতী শোনেন নারদের কাছে, একমাত্র দেবাদিদেব মহাদেবই তাঁর যোগ্য স্বামী। পিতা গিরিরাজও বেশ সম্মত। তখন থেকেই দেবাদিদেব পার্বতীর আরাধ্য দেবতা হয়ে ওঠেন। হঠাৎ পর্বতরাজের কাছে খবর আসে, শিবশম্ভু স্বয়ং এসেছেন হিমালয় পর্বতে। যোগিশ্রেষ্ঠ শংকর সতীর দেহত্যাগের পর থেকে কৈলাসে খুব একটা থাকেন না; সুন্দর কোনও নির্জন স্থানে কিছুদিনের জন্য থাকেন ঠিকই, কিন্তু ধ্যানেই কেটে যায় সময়। হিমালয় তাঁর কন্যাকে নিয়মিত পাঠাতে শুরু করলেন শিবের কাছে। যদিও সেবার জন্য নন্দী-ভৃঙ্গী সবাই আছে—কিন্তু পার্বতী আনন্দে জল তোলেন, মালা গাঁথেন—এ যেন তাঁর স্বপ্নসৌভাগ্য। যখন ধ্যান থেকে ওঠেন যোগিবর তখন তাঁর একটি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত রাজকন্যার সব ক্লান্তি ভুলিয়ে দেয়। তিনি ফিরে যান।

এদিকে তারকাসুরের অত্যাচারে বিপর্যস্ত দেবতারা জানতে পারেন যে শিব-পার্বতীর সন্তানই কেবল তারকাসুরকে মারতে পারবে। একটু দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন দেবরাজ। প্রেমের দেবতাকে পাঠালেন। কিন্তু শংকরের তৃতীয় চোখের আগুনে শরীরী কাম পুড়ে ছাই হয়ে গেল। চোখের সামনে কন্দর্পের পরিণতি দেখে পার্বতী বুঝলেন যে শিবকে, কল্যাণকে রূপরসের সরল রাস্তায় পাওয়া যাবে না—তার জন্য ত্যাগ-তপস্যা চাই। ''যাহা মরণীয় যাক মরে, জাগো অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্তি ধরে''—শুরু হল পার্বতীর তপস্যা—আর

সেই তপস্বিনী রূপই দেবী ব্রহ্মচারিণী।

এক অপূর্ব মানুষের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল পাঁচ বছরের সারদার। যখন তিনি কামারপুকুরে আসেন আবার, তখন কিশোরী সারদা স্বামীর ব্যবহারে-শিক্ষায় আনন্দময় স্বভাবে ভরপুর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্বামী দক্ষিণেশ্বরে ফিরে গিয়ে কোন সাধনায় যে ডুবে গেলেন—ভুলেই গেলেন স্ত্রীর কথা। গ্রামের বউ-ঝিরা আঙুল তোলে : 'পাগলের বউ'। সারদার সেই নীরব সহনশীলতার দিনগুলি পার্বতীর তপস্যাকে মনে করিয়ে দেয়। তাছাড়া ব্রহ্মচারিণী সারদার সারা জীবন তো স্বামীর অনুগমনে তপস্যাতেই কেটেছিল।

চন্দ্রঘণ্টা

তৃতীয়া তিথির দেবী চন্দ্রঘণ্টা। ঘণ্টার আকারের চাঁদ মায়ের সিঁথির কাছে জ্বলজ্বল করে—সে-চাঁদের জোছনা-ধোয়া স্নিগ্ধতায় শান্তি ছড়িয়ে যায়। যত তাঁর কাছে যাওয়া যায় ততই শান্তিতে ধুয়ে যায় মন। জয়রামবাটীর মাটির দাওয়ায় বসে আছেন সেই উদার অবারিত কারুণ্যমূর্তি—''কঙ্কণ পরা ওই দুটি হাতে/ স্পর্শমাত্র পার পরাজ্ঞান দিতে/ করুণায় মাখা স্নিগ্ধ চাহনি/ অন্তর ভরে দিব্য বিভায়।"

দেবীকে মহিষাসুর বধের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র দিয়েছিলেন ঘণ্টা। সেই ঘণ্টাধ্বনিতে তিনি অসুরদের তেজ হরণ করেছেন। 'ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি'—ভক্ত প্রার্থনা করেন : তোমার ঘণ্টাধ্বনিতে আমায় রক্ষা করো। যারা অধ্যাত্মপথে এগোয় তারা সেই মিষ্টি ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পায়। আর যারা ঘোর বিষয়ী তারাও কখনও শোনে, শুনে ভীত হয়।

সারদা মঠের প্রথম অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজী প্রথম জীবনে শ্রীশ্রীমার সেবার সুযোগ পেয়েছিলেন। শরৎ মহারাজের দেহত্যাগের পর তিনি দীর্ঘ সাতাশ বছর কাশীতে নীরব তপস্যায় কাটান। সেইসময়ের এক অভিজ্ঞতার কথা জানা যায়। একদিন মাঝরাতে উঠে জপ করছেন—শুনতে পেলেন ভারি মিষ্টি ঘণ্টার আওয়াজ। তিনি বুঝতে পারেন না কোথা থেকে আসছে—এই মাঝরাতে কোন মন্দিরে আরতি হচ্ছে! পরদিন সকালে কাশী সেবাশ্রমে গিয়ে কেদারবাবাকে (স্বামী অচলানন্দজী) জিজ্ঞাসা করলে মহারাজ আনন্দিত হয়ে বলেন, সাধনার এক পর্যায়ে এই ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়।

চন্দ্রঘণ্টা দেবী সুমধুর ঘণ্টারবে ভক্তকে কাছে টেনে নেন।

চতুর্থী তিথির দেবীরূপ কুষ্মাণ্ডা। উষ্মা কথার অর্থ তাপ। কু উষ্মা হল এমন তাপ যা আমাদের বড় কষ্ট দেয়। পৃথিবীতে আমরা তিন ধরনের দুঃখে জ্বলে যাই। প্রকৃতি যেমন সুখাবহ রচনা করেন তেমনই তাঁর রোষের সামনে আমাদের সাজানো ঘর এক লহমায় শূন্যও হয়ে যেতে পারে। সেই যে ঝড়বৃষ্টি-বন্যা-খরা-ভূমিকম্পের বিধ্বংসী তাপ—তাকে বলে আধিদৈবিক দুঃখ। সাপখোপ-কীটপতঙ্গও দুঃখ আনে—আধিভৌতিক দুঃখ। ভাইরাসকে কি আধিভৌতিক বলা যায়? মহামারি-বিধ্বস্ত আজকের বিশ্ব আধিভৌতিক উত্তাপ খুব ভালভাবে চেনে। আর আছে আমায় নিয়ে আমার দুঃখ—আধ্যাত্মিক দুঃখ। শরীরের রোগ, মনের ব্যাধি—সম্পর্কের টানাপোড়েনে অহংকেন্দ্রিক যত বেদনা—সব আত্মসম্পর্কিত আধ্যাত্মিক দুঃখ। এই ত্রিতাপ—এই ত্রিবিধ কু-উষ্মা যিনি অণ্ডে বা উৎসতে আবার শোষণ করে নিতে পারেন তিনিই কুষ্মাণ্ডা

দেবী। দেবীর কাছে যে প্রার্থনা করে, ''নিবারি সর্ব বিপদে রাখো মা অভয় পদে''—দেবী তার ত্রিতাপ হরণ করেন। সাধক ঋষিরা তাই বলেন—যত দুঃখই আসুক, অভয়ার শরণ নাও।

কুষ্মাণ্ডা

স্কন্দমাতা

এক মাঝি-বউ নিয়মিত আসত জয়রামবাটীতে। হঠাৎ বেশ কিছুদিন সে আসে না। যখন এল, শ্রীশ্রীমা উদ্বিগ্ন হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। বৃদ্ধা সস্নেহ কোমলতার স্পর্শে হু হু করে কেঁদে উঠে জানাল, তার একমাত্র রোজগেরে জোয়ান ছেলেটি মারা গেছে। ''সে কি মাঝি-বউ?''—মা বসে পড়লেন দাওয়ায়। তারপর কী করলেন? একটিও সান্ত্বনাবাক্য বললেন না, শুধু বৃদ্ধার সঙ্গে কেঁদে গেলেন। কান্নায় কান্নায় শোক যেন টেনে নিলেন। তার চুলে তেল মাখিয়ে দিলেন, সে স্নান করল, খেল—আর যখন বিকেলে ফিরে যাচ্ছে তখন এক অপার তৃপ্তি সন্তানহারা মা-টির মুখচ্ছবিতে। এভাবেই দেবী কুষ্মাণ্ডা শোকতাপ হরণ করেন।

পঞ্চমী তিথির দেবী স্কন্দমাতা। শিবশক্তির মিলনে জন্ম নিয়েছিলেন দেবসেনাপতি কার্তিক। পুরাণকথায় দেবী সেই কার্তিক বা স্কন্দের জননী—স্কন্দমাতা। শিব বা কল্যাণের সঙ্গে যখন শক্তি যুক্ত হয় তখন সেই লোককল্যাণমুখী শক্তি এক অপরাজেয় মহাভাবনার জন্ম দেয় যার সাহায্যে অন্তরে-বাইরে অনেক অসুর সংহার করা যায়। শুভশক্তির উৎস দেবী স্কন্দমাতা। যদি কেউ কল্যাণব্রতে এগিয়ে যায়, তাহলে শুভশক্তি তাকে সুরক্ষা দেয় জননীর মতন।

কয়েকদিন আগে একটি ভিডিও দেখছিলাম। বন্যায় ভেসে-যাওয়া গ্রামে বুকজলে দাঁড়ানো নারীপুরুষের বিরাট লাইন—খাবার নেওয়ার পাত্র হাতে। বেলুড় মঠের শাখা চণ্ডীপুর মঠের ব্যবস্থাপনায় নৌকায় বিরাট বিরাট হান্ডাভরা খিচুড়ি। যতদিন জল না নামছে, তাঁরা ওই জলমগ্ন মানুষগুলিকে খাওয়ানোর ভার কাঁধে তুলে নিয়েছেন। ঠিক দুর্গাপূজার প্রসাদ বিতরণের পঙ্‌ক্তি-ভোজনের সময় যেমন, তেমনি ওই প্লাবন-বিধ্বস্ত মানুষগুলিকে অন্নভোগ বিতরণের সময়ও ভারপ্রাপ্ত সাধু জয়ধ্বনি দিলেন : 'জয় মহামায়ীকি জয়'—এই শিবব্রতে শক্তিময়ী জগজ্জননী মা, তুমি সহায় হও।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘজননী স্কন্দমাতা দেবী সারদা। যেমন কার্তিক, তেমনি গণেশ—কাউকে গর্ভে ধারণ না করেও দেবী গণেশজননী, দেবী স্কন্দমাতা, ঠিক তেমনই জাগতিক দৃষ্টিতে একটি সন্তানেরও জননী নন সারদা; কিন্তু বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ-ক্রমে যে-কুমার কার্তিকেয়রা এক প্রবাহের জন্ম দিয়েছেন, সেই সঙ্ঘরূপী স্রোতস্বিনীর মাতা তিনি—এই বিপুল কর্মযজ্ঞের সকল শক্তির উৎস।

ক্রমশ